শেষ মৃত পাখি

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

অমিতাভর উপন্যাস

* * *

'তাহলে নিখুঁত খুন ঘটতে পারে না বলেই তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞাসা করল প্রণবেশ।

'উঁহু। ঘটতেই পারে। কিন্তু সেটাকে নিখুঁত প্রমাণ করা সম্ভব নয় এটুকু দাবি।' সশব্দে নস্যি টেনে শুদ্ধসত্ত্ব উত্তর দিল। তারপর লম্বা শরীরটা টান টান এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারের ওপর।

'কেন?'

'দ্যাখো, পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান এবং নিখুঁত খুনি হিসেবে তুমি কাউকেই দাগিয়ে দিতে পারবে না। সহজ কারণ। যে নিখুঁত খুন করবে, সে চিহ্নিত হবে না। ধরাও পড়বে না। তাই দাগানো অসম্ভব।'

'ঠিকই। কিন্তু খুনির বেলায় যে তত্ত্ব খাটে, খুনের বেলায় খাটে না।'

'খাটে, অন্য রকমভাবে। যে খুনটা নিখুঁত হবে, তাকে তুমি খুন হিসেবে শনাক্ত করতে পারবে না। ভাববে আত্মহত্যা বা অ্যাকসিডেন্ট। আর শনাক্ত করলে, সেটা নিখুঁত হবে না।'

'কেন হবে না? খুনি ধরা না পড়লেই হবে।'

'উফ্! আমরা এখানে হত্যার দর্শন নিয়ে আলোচনা করছি।' বিরক্ত স্বরে শুদ্ধসত্ত্ব বলল। 'খুন হলো একটা শিল্প। আর গোয়েন্দা হলো সেই শিল্পের ক্রিটিক। সমালোচক যেমন শিল্পকর্মের ভেতর থেকে লুকানো নানা চিহ্ন খুঁজে খুঁজে ব্যাখ্যা করেন, গোয়েন্দাও একটা হত্যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন ক্লু খুঁজে খুঁজে হত্যার ব্যাখ্যা দেয়। শুদ্ধতম শিল্প কী? ব্যাখ্যার অতীত। কবির কথায়, অবাঙ্‌মনসগোচর। ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন যে নাদ, অথবা ভ্যান গঘের ছবিতে এক পাশ থেকে এসে ঠিকরে পড়া এক অপার্থিব আলো। শুদ্ধতম খুন কী? একই রকম। ব্যাখ্যার অতীত।'

'তার মানে, তোমার কথামতো, নিখুঁত খুন আসলে সেটাই...' প্রণবেশ সামনে ঝুঁকল।

'যা অ্যাবস্ট্রাক্ট। হাইজেনবার্গের যুক্তি স্মরণ করো। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়তে যদি কোনো ঘটনা ধরা না দেয়, তাহলে তার ঘটা অথবা না-ঘটা দিয়ে কিছুই এসে যায় না।'

'কিন্তু আর এক ভাবেও বিশুদ্ধ হত্যা হওয়া সম্ভব।' প্রণবেশ চোখ সরু করল।

'কী?'

'যদি আসল খুনি ছাড় পেয়ে গিয়ে অন্য কেউ অভিযুক্ত হয়!'

'প্রশ্নটা হলো, তাহলেও কি আমাদের জানামতে সেটা পারফেক্ট মার্ডার? একমাত্র খুনি জানে, সেটা পারফেক্ট। আমি তুমি? বাকি পৃথিবী? তার মানে সব সময়েই পারফেক্ট মার্ডারে শিল্পী এবং ক্রিটিক, এই দুইয়ের মধ্যে ইনফরমেশন অ্যাসিমেট্রি থাকবেই। থেকেই যাবে। আর সেটাই একটা মার্ডারকে পারফেক্ট হতে দেবে না।'

'তাহলে এই কেসটা যেটা এখন আমরা স্টাডি করব, তুমি বলছ পারফেক্ট মার্ডার হবে না? আগে থেকে বলে দিচ্ছ?'

'আহা আমার কথায় অত ভরসা করবেই-বা কেন! নিজের চোখেই দেখবে না হয়। সবে তো গল্প শুরু হচ্ছে হে! এখনই ধৈর্য হারালে চলবে?'

—অমিতাভ মিত্র

ক্রমশ তোমাকে ঘিরে এত সব অরণ্যসম্পদ
কীভাবে যে বেড়ে উঠছে! অবিন্যস্ত পাতার সবল
বাহুপাশে শুয়ে শুয়ে ভাবি, এই পাহাড় ওই হ্রদ
স্পর্শ করে জিপগাড়ি ছুটে গেলে ওই বনস্থল

কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে স্বপ্ন, দ্বিপ্রহর।...

—প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

আধো তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখলাম, সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েছি। ক্যাঁচ করে দরজা খুলছে, আমি ঢুকে পড়ছি ধুলো আর মাকড়সার জালভর্তি ড্রইংরুমে। দেখতে পাচ্ছি, আধো অন্ধকারে ওলটানো সোফা, যার ছেঁড়া চামড়া দিয়ে পুঁজের মতো বেরিয়ে এসেছে লালচে তুলো। একটা হাওয়া দিচ্ছে আচমকা, ঘুলঘুলির কাছ থেকে টিকটিকি ডেকে উঠছে, আর হা হা নির্জনতার মধ্যে বসে পড়ছি ধুলোমাখা চেয়ারে, মেঝেতে পায়ের আঙুল পেতে শুনছি অকরুণ পাথরের হিম, টেবিলে বহুদিনের পুরোনো বোতলের জলে শ্যাওলা ভাসতে দেখছি। আমার হাত চলে যাচ্ছে টেবিলের এক কোনায় পড়ে থাকা ছোটবেলার মাদার ডেয়ারির কার্ডে, যেটার গায়ে অজস্র টিকচিহ্নের আশ্চর্য জ্যামিতি আমাকে কাটাকুটি দেখিয়েছে। ওষুধের রুপোলি স্ট্রিপের ত্বকে তখন হলদে আভা, আধখাওয়া আপেল শুকিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে অনাদরে, কানা ফাটা স্টিলের বাটির আলগোছে ঝরে থাকা মুড়ির টুকরো যাদের কখনো কেউ কুড়িয়ে নেবে না। তখন আমার চোখ যাচ্ছে বন্ধ দরজার দিকে, যার ওপাশে বেডরুম। আস্তে আস্তে হেঁটে সেই দরজার সামনে দাঁড়াচ্ছি। কাঠের গায়ে কান পেতে শুনছি ওপাশের নৈঃশব্দ, যা তীব্র চিৎকারে কয়েকশ টুকরো হয়ে ফেটে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার ভেতর।

পাইলটের যান্ত্রিক গলার ঘোষণায় স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল... প্লেন এবার নামছে। মেঘ আর কুয়াশার কম্বলের ভেতর দিয়ে পেঁজা তুলোর মতো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে পাহাড়, রাস্তা, সবুজ খেত, খেলনাবাড়ির জলছবি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার মুখে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম দিকের আকাশ কালো। মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে রাস্তার দুইধারের গাছের দল এসে নুয়ে পড়ছে গাড়ির ওপর। সবে দুপুর তিনটে, কিন্তু এখনই অন্ধকারের একটা পাতলা চাদর জলরঙের মতো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর গায়ে। পাহাড়ে সন্ধে নামছে।

পঁচাত্তর মিনিটের বিমানযাত্রা যদি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে পাঁচ ঘণ্টা লেট হয়, তাহলে মনমেজাজ যে রকম খিঁচড়ে থাকে, সেটাকেই যোগ্যভাবে সংগত করছে আবহাওয়া। পাঁচ ঘণ্টা দমদমের লাউঞ্জে বসে থেকে পা গিয়েছে। কত আর কালো কফি গেলা যায়! একেই আমার অনিদ্রার প্রবণতা। চোখ লাল হয়ে থাকে সব সময়। বুজে আসতে চায় কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও। যেটুকু তন্দ্রা এসেছিল প্লেনের ভেতর, সেখানেও চোরা শিকারির মতো হানা দিয়েছে ছেঁড়া স্বপ্ন ও দুর্ভার দৃশ্য। ঘুম হয় না তাতে, শুধু অস্বস্তি। এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা ছিল। হয়তো সিনক্লেয়ারের ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েও নিতাম, যাতে চোখ দুটোকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দেওয়া যেতেই পারত। কিন্তু চলন্ত গাড়ির ভেতর ঘুমোতে পারি না। যেহেতু লেট হচ্ছে, পৌঁছেই ছুটতে হবে চৌধুরী ভিলা। ক্লান্তি ও আবগারি আবহাওয়া— এই দুই মিলে শরীরকে শিথিল করে দিচ্ছে। স্কার্ফটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিলাম। ঠান্ডা লাগার ধাত ছোটবেলা থেকেই। শেষবার এখানে এসেছিলাম ২০০৮ সালে। প্রেসিডেন্সির বন্ধুদের সঙ্গে। সেবারও প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রকোপে জ্বর এসেছিল। গত দশ বছর ধরে দিল্লির বাসিন্দা হয়েও এবং তার চরমপন্থী জলবায়ু ও দূষণের সঙ্গে লড়তে লড়তেও, আমার ফুসফুস সহনশীল হয়নি।

শিলিগুড়ি থেকে বেরোবার মুখে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এল। রাস্তার একধার খোঁড়া হয়েছে। অনেকটা দূর অবধি পথের চেহারা অনেকটা ওম পুরীর গালের মতোই এবড়োখেবড়ো। বৃষ্টির ঝাপটা আর ঘন মেঘের নিচে বিহারি বস্তি, তাদের নোংরা উঠোন, কাঁচা নর্দমার উথলে ওঠা পাঁক, প্লাস্টিকের পর্দা, বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা একলা কুকুর। রাস্তার দুধারে সার বেঁধে ভিজছে নিভে যাওয়া ট্রাক। ধাবাগুলোর পর্দা ফেলা, ভেতর থেকে হিন্দি গানের সুর গড়িয়ে আসছে। একটা বালতি হাওয়ার থাপ্পড় খেয়ে উল্টে পড়ল দুম করে, আর শাড়ির আঁচল মাথায় এক দেহাতি মেয়ে বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আমার গাড়িটার দিকে। এই আবহাওয়াতে পাগল না হলে কেউ পাহাড়ে যায়?

গাড়ির চালক মদন গুরুং রেডিওর দিকে হাত বাড়ালেন, 'এফ এম শুনোগে ম্যাডাম?'

চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। এই মুহূর্তে একটা বিছানা ছাড়া আর কিছুই চাই না আমি।

গাড়ি আস্তে আস্তে পাহাড়ি পথ ধরছে। পাল্টে যাচ্ছে আশেপাশের গাছেদের ধরন। জঙ্গল দূর থেকে এগিয়ে আসছে গাড়ি লক্ষ্য করে। বৃষ্টির ছাট এখন কম, কিন্তু ভ্যাপসা বাষ্প উঠে কাচ ভাপিয়ে দিচ্ছে। মদনদা বাধ্য হচ্ছেন হালকা করে এসি চালাতে, নাহলে কাচ পরিষ্কার হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই কাতর গলায় অনুরোধ জানাচ্ছি, 'প্লিজ এসিটা বন্ধ করে দিন।' আগামী কয়েক দিন আমাকে অসুস্থ হলে চলবে না। একটা বড় বোল্ডারকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে মদনদা সামনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'ম্যাডাম জার্নালিস্ট হো ক্যায়া?'

'হ্যাঁ।' মদনদা জানবেন, স্বাভাবিক। অফিসের শিলিগুড়ি ব্যুরো থেকে এই গাড়িটার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সামনের কয়েক দিন আমার সঙ্গে থাকবে।

'ইধার কি ভ্যাকেশন কাটাতে এসেছেন?' মদনদা হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি মিশিয়ে অদ্ভুত একটা ভাষায় কথা বলেন।

'নাহ। কাজ আছে।'

মদনদার বকবক করবার অভ্যেস আছে। তাতে এমনিতে সমস্যা হতো না, কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে না। তবে আগামী কয়েক দিন আমার সঙ্গী হিসেবে থাকবেন যখন, চটালে চলবে না। খোশগল্প, ঠিক গল্প না হোক, অন্তত গপ্পে মানুষকে মুখ নাড়াবার সুযোগ করে দিয়ে হুঁ হুঁ করে তাল ঠুকে যাওয়াটাও একটা শিল্প।

'আপনার কি দার্জিলিংয়েই বাড়ি, মদনদা?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। জন্ম থেকেই এখানে। আমার বাপ-দাদারাও তা-ই। চকবাজারের নিচে পুলিশ স্টেশন দেখবেন, তার বাঁ পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ভুটিয়া বস্তির ধার ঘেঁষে। ওখানে বাড়ি। লাস্ট বত্রিশ বছর এই লাইনে ম্যাডাম। কোনো দিন গাড়ি ঠুকিনি। কেউ বলতে পারবে না যে বেগড়বাই করেছে। আপনাদের কোম্পানির লোকজনকেও আগে অনেকবার নিয়ে এসেছি এখানে। উইন্ডমেয়ারে এসেছিলেন, কাগজের বিশাল বড় সাহেব। আমাকে একটা সোয়েটার গিফট করে গেছেন। বহুত জেন্টলম্যান থা। আপনি কি কলকাতায় থাকেন ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, জন্ম, বড় হওয়া সব কলকাতায়। তার পরে দিল্লি চলে যাই।'

শালের জঙ্গল এখন ঘিরে ধরেছে আমাদের। সেই কারণেই বৃষ্টির ঝাপটা জোরে আসছে না। আমার টনসিলের পক্ষে বিপজ্জনক জেনেও গাড়ির কাচ নামানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। একঝলক ঠান্ডা বাতাস গড়িয়ে ভেতরে। একটা বুনো ঝোপ রাস্তার প্রায় মাঝবরাবর পর্যন্ত মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে, যেন লাফ দিয়ে ঢুকে পড়বে জানালার ফাঁক গলে। আঙুল দিয়ে ভেজা পাতার গায়ে বুলিয়ে দিলাম।

গাড়ির ছাদ চুইয়ে টপ করে এক ফোঁটা জল কপালে এসে পড়ল। শিউরে ওঠার মতো একটা ঠান্ডা মন কেমন অনুভূতি। আগে হলে বাবা এই সময়টায় টিভিতে বিশেষ বিশেষ খবর চালিয়ে দিত।

'কাচ তুলে দিন! এই সময়ে জঙ্গলে মশাদের দাপট বড়ে। আপনারা তো প্লেন এরিয়ার মানুষ, রক্ত বেশি মিষ্টি হয়। গন্ধে গন্ধে শালাদের দল ঢুকে পড়বে।'

অর্ধেকটা কাচ তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। প্রায় নয় ঘণ্টা সিগারেট খাইনি, কিন্তু মনেই ছিল না। এমনকি বাগডোগরাতে নেমেও খাওয়ার কথা মনে হয়নি। জোরে একটা টান মেরে মাথার কোষে ধোঁয়াটাকে চারিয়ে দিতে দিতে চাঙা লাগল অবশেষে। এবার কিছু জরুরি কথা বলে নেওয়া যায়।

'আমি হোটেল সিনক্লেয়ারে থাকব। কাল সকাল সাতটার মধ্যে ওখানে চলে আসবেন। আর আজ আপনাকে রাত পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সিনক্লেয়ার। বড়িয়া হোটেল। ম্যালের পাশেই। আপনাদের কাগজের সাবরা এসে আগেও থেকেছেন।'

আমি যে ভারত-বিখ্যাত কাগজটির সরাসরি কর্মচারী নই, বরং তার সিস্টার অর্গানাইজেশন হিসেবে আর একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের সাংবাদিক, সেসব মিহি পার্থক্যের কথা মদনদাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। একটা সিগারেট বার করে মদনদার কাঁধে টোকা মারলাম, 'চলে?'

লাজুক হাসলেন মদনদা, 'ভেরি কস্টলি! দিন একটা!'

আয়েশ করে সিগারেট টান মেরে মদনদা আবার মুখ খুললেন, 'ভুল সময়ে এসেছেন ম্যাডাম। এই সিজনে দার্জিলিংয়ে কেউ থাকে না। সারাক্ষণ খালি বৃষ্টি, আর ফগ। চার হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার আশা ছেড়েই দিন। হোটেল থেকেই বেরোতে পারবেন না সাইটসিইংয়ের জন্য।'

সিগারেট টান মেরে জানালার গায়ে মাথা রাখলাম। মদনদা যদি জানতেন, এই আসাটুকুর জন্য কতখানি কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমায়! চুয়াল্লিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক রহস্যকাহিনিকে কবরখানা থেকে তুলে এনে স্নান করিয়ে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরিয়ে এবং কঙ্কালের ওপর রক্তমাংসের প্রলেপ দিয়ে জীবন্তভাবে তাকে ভদ্রসমাজে হাজির করানোটা এতটাই কঠিন যে তার কাছে দার্জিলিংয়ের এই অকরুণ আবহাওয়াও আপাতত তুচ্ছ। না, অরুণ চৌধুরী আমাকে দার্জিলিং আসতে বলেননি। বরং ফোন করে যখন তাঁকে আমার উদ্দেশ্য বলেছিলাম, একটুক্ষণ চুপ থেকে মৃদু কিন্তু কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পুরোনো কথা খুঁচিয়ে ঘা করতে চাইছেন কেন?'

সামান্য হাসির আভাস এনেছিলাম গলাতে, 'আপনি কি চান না, সত্যিটা সকলের সামনে আসুক? যে রহস্য গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যজগৎকে

আন্দোলিত করেছে, সারা জীবন সন্দেহের খাতা থেকে আপনার নাম মুছে দিতে বাধা দিয়েছে, তার একটা কিনারা হোক, এটা কি আপনার অভিপ্রায় নয়? আমি কিনারা করব বা পারব আদৌ, সেটা বলছি না। আমার কাজ তো আর তদন্ত করা নয়। কিন্তু আমি যেটা পারি, সেটাই করতে চাইছি। ঘটনাটায় আপনার বয়ানটা তুলে ধরতে চাইছি পাঠকের সামনে।'

'কেন? হঠাৎ আমার ওপর এত দিন পরে এতটা সদয় কেন হয়ে উঠল ভারতের মিডিয়া?'

'কারণ, কেসটা পড়বার পর আমার মনে হয়েছিল যে আপনার কথাটা ঠিকভাবে উঠে আসেনি। আপনার কি মনে হয় না যে বাংলা ভাষার সম্ভবত সবথেকে বাণিজ্যসফল লেখক নিজের কথাটুকুই প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? আমার সিরিজটা পড়েছেন কি না জানি না। পড়লে দেখবেন, আমি পুলিশের রিপোর্ট অথবা কোর্ট প্রসিডিংসের থেকে সাধারণত বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান, সাধারণ মানুষের সাক্ষ্য ইত্যাদির ওপরে। পুলিশ অনেক সময়েই আমার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও এনেছে এই কারণেই। কিন্তু যেটা দেখাতে চাই, তা হলো সন্দেহভাজনের নিজস্ব বক্তব্য, যেটাকে সরকারি দলিল অতটা গুরুত্ব দেয় না।'

'হুঁ। আমি এখনই কিছু জানাতে পারছি না। আপনি কাল ফোন করুন একবার। তখন জানাব, মুখ খুলতে রাজি কি না। আজকের রাতটা ভেবে দেখি।'

পরদিন অরুণ চৌধুরী নিজেই সকালে ফোন করে জানালেন যে তিনি চাইছেন না থিতিয়ে পড়া জল আবার ঘোলা করতে। কাজেই, আমি যেন দার্জিলিং না আসি।

তারপর থেকে সাত দিন বার চারেক ফোন করেছি। বারে বারে বুঝিয়েছি। ভেবে দেখার অনুরোধ করেছি। অরুণ কর্ণপাত করেননি। তাঁর একটাই বক্তব্য, ১৯৭৫ সালে যা ঘটে গিয়েছে তাকে ২০১৯-এ খুঁচিয়ে তুলে অকারণ বিতর্ক তৈরি করতে চান না। তাঁর ভাবমূর্তি? সেটার অস্বচ্ছতা এত দিন বাদে আর কাটবার নয়।

শেষে আমার এডিটর মহেশ যোশি হতাশ গলায় বলেছিল, 'এটা আর হবে না তনয়া। লুক ফর সামথিং এলস।'

আমি এত সহজে ছাড়তে প্রস্তুত ছিলাম না অবশ্য। ছোটবেলা থেকেই অপরাধ কাহিনি, গোয়েন্দা গল্প আর রহস্যের পোকা হিসেবে অরুণ চৌধুরীর নাম আমার অজানা ছিল না। কারণ অরুণ চৌধুরী স্মরণযোগ্য অতীতে বাংলা, শুধু বাংলা কেন, ভারতীয় রহস্য সাহিত্যের অন্যতম ব্যাংকেবল নাম, যাঁর এক একটা বই গড়ে তিরিশ হাজার কপি বিক্রি হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ হয় তাঁর বই। সিনেমাও হয়েছে বেশ কয়েকটা। তিন বছর আগে সাহিত্য অকাদেমি পেয়েছেন। একমাত্র ভারতীয় লেখক, যাঁর বই রহস্য উপন্যাসের নোবেল, ইন্টারন্যাশনাল এডগার পুরস্কারের

জন্য একবার শর্টলিস্টেড হয়েছিল। কলকাতা থেকে সারা জীবন বহুদূরে দার্জিলিংয়ে থেকেও অরুণ চৌধুরী সেই বিরল বাঙালিদের একজন, যাঁরা মেধায়, মননে ও স্বীকৃতিতে আন্তর্জাতিক। সবচেয়ে বড় ব্যাপার তাঁর উপন্যাসের সাহিত্যগুণ উৎকৃষ্ট মানের, গদ্যভাষাসমৃদ্ধ, শৈলী অভিনব, এবং সামগ্রিকভাবে সিরিয়াস সাহিত্যের সারিতে স্থান পাবার যোগ্য। এমনকি মাঝে মাঝে সমালোচকেরা এই অভিযোগও এনেছেন যে অরুণ নিজের সিরিয়াস লেখকের তকমা ধরে রাখতে এতই উদ্বিগ্ন যে সাহিত্যিক স্টাইলের বাড়াবাড়িতে গোয়েন্দা কাহিনির রোমাঞ্চকে বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লট, মোটিভ এবং মনস্তত্ত্ব বয়নের ক্ষেত্রে অরুণ কোনো কোনো বইতে আন্তর্জাতিক ক্রাইম কাহিনির মানে পৌঁছে গিয়েছেন বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছিল।

আর অরুণ চৌধুরীর সূত্রে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রহস্যটার ব্যাপারে অবগত ছিলাম। বাবা প্রথম গল্প করেছিল, এবং ভীষণ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল শুনেই। একটা গোটা ছুটির দুপুর আমি আর বাবা বসে বসে অপরাধটা নির্মাণ পুনর্নির্মাণের খেলায় মেতেছিলাম। তারপর বড় হয়ে ইন্টারনেট ঘেঁটে এই বিষয়ে আরও পড়েছি। জেএনইউ থেকে বেরিয়ে যখন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমে ঢুকি, সেই সময়ে আবার কী একটা আলোচনায় অরুণ চৌধুরীর নাম সামনে এসেছিল। চাগাড় দিয়ে উঠেছিল পুরোনো কৌতূহল। কয়েক দিনের ছুটিতে কলকাতায় ফিরে পুলিশ রেকর্ড জোগাড় করে আবার খুঁটিয়ে পড়েছিলাম।

অন্যমনস্কভাবে কখন যে ডান হাতের পোড়া জায়গাটায় আঙুল বোলাতে শুরু করে দিয়েছি, জানি না। চমক ভাঙল সিগারেটের ছ্যাঁকায়। লম্বা ছাই টুপ করে গাড়ির ভেতর ভেঙে পড়ল। তাড়াতাড়ি সিগারেটটা জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে কাচ তুলে দিলাম।

রাস্তার অনেকটা নিচে চোখ ভাসিয়ে দিলে এখন দেখতে পাচ্ছি, হালকা ছাইরঙা বৃষ্টির দল ধীরে ধীরে দখল নিচ্ছে উপত্যকার। সারি সারি বস্তি আর তাদের টিনের খুপরি, মোমোর দোকান, উগ্র হোর্ডিং, পাহাড়ের গা বেয়ে চাবড়া চাবড়া ক্ষতের মতো বাদামি খেত—ধূসর মেঘে ছুপিয়ে দিচ্ছে। একশ বছর আগের বস্তি ও বিজ্ঞাপনহীন উপত্যকার সরল সবুজ চেহারাটা ধরা আছে একটি ভুলে যাওয়া ইংরেজি কবিতায়, যা এখন আমার ব্যাগের ভেতর একটি পুরোনো বইয়ের পৃষ্ঠার হলদে ভাঁজে শুয়ে আছে। ব্যাগের চেইন খুললাম। একটা সুডোকুর ম্যাগাজিন, অর্ধেক পড়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাড়াহুড়ায় ব্যাগেই থেকে গেছে। মার্ডার অব রজার অ্যাক্রয়েড, সেই স্কুলজীবনে বাবা কিনে দিয়েছিল। প্লাস্টিকের তাপ্পি মারা, স্পাইন ভেঙে গিয়েছে... কত দিন হয়ে গেল পড়িনি! তার নিচে সেই হলদে ভাঁজের

পুরোনো বই। এত দিন ধরে যে যে শহরে থেকেছি, বইটাকেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি, রজার অ্যাক্রয়েডের পিঠাপিঠি ঘুমিয়েছে আমার স্যুটকেসের অন্ধকারে, কি বইয়ের তাকের ভুলে যাওয়া কোনায়। এমন নয় যে খুব পড়তাম, বা প্রিয় বই ছিল। হয়তো অভ্যেসের বশেই। পাতা লালচে হয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরের মলাটে শৌখিন ক্যালিগ্রাফিতে 'অমিতাভ মিত্র' নামটা এখনো জ্বলজ্বলে। পাতলা, স্যাঁতসেঁতে পাতাগুলো নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকলাম। যে সময় হারিয়ে গেছে, যে মানুষকে সবাই ভুলে গেছে, তার কিছুটা অবশেষ কি মিলবে এখানে? পুরোনো কাগজের গন্ধ পেলাম না। মায়ের হাতের রান্নার মতো, অথবা বাবার ড্রয়ারে লুকানো কড়া চারমিনারে প্যাকেটের মতোই, পুরোনো বইয়েরও স্বাদ কিছু থাকে না। থাকে শুধু স্মৃতি।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত আনসলভড ক্রাইমগুলো নিয়ে আমার সিরিজটা শুরু করবার সময়েই স্থির করে নিয়েছিলাম যে সিরিজের শেষ স্টোরি হবে অরুণ চৌধুরীর রহস্যময় ঘটনা, যার এখনো কিনারা হয়নি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ছটা ঘটনা নিয়ে কাজ করব। কিন্তু লেখাগুলো তুমুল জনপ্রিয় হয়ে গেল। আমি সাংবাদিকতার একটা ছোটখাটো পুরস্কার পেলাম। একটা প্ল্যাটফর্ম চুক্তি করতে চাইল এই লেখাগুলো নিয়ে ওয়েব সিরিজ বানাবে। ম্যাগাজিনের তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার ফলে যেটা হলো, স্টোরির সংখ্যা আরও বাড়াতে হলো। ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিল, অন্তত দুই বছর ধরে টানার মতো রসদ চাই। ফলে শেষ দুই বছর অবিশ্রান্তভাবে ছুটতে হলো সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। উদ্দেশ্য, অমীমাংসিত রহস্যদের মানুষের চোখের সামনে আনতে হবে। ছয়টা ঘটনা শেষে পনেরোটায় এসে ঠেকল। কিন্তু তারপরও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম যে অরুণ চৌধুরীকে দিয়েই সিরিজ শেষ হবে। আমার ছোটবেলা, আমার বাবা, আমাদের একসঙ্গে বই পড়া, আমাদের সেই দুপুরটা, এই সবকিছুর প্রতি এর থেকে ভালো হোমাজ আর কী-ইবা হতে পারত!

কিন্তু অরুণ চৌধুরী রাজি হলেন না। মহেশের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করলাম আমাকে আরও সময় দেবার জন্য। কিন্তু তত দিনে সিরিজের জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে একটা সপ্তাহও স্টোরি ছাড়া ম্যাগাজিন ছাপানোর কথা ভাবা যাচ্ছে না। হিসাবটা ছিল, প্রতি দুই মাসে একটা নতুন স্টোরি দেব। এক মাস লাগবে গবেষণার জন্য, আর এক মাস লেখা ও সম্পাদনার জন্য। গড়ে ষোলো হাজার শব্দের স্টোরি, যা প্রতি সপ্তাহে দুই হাজার শব্দের হিসাবে আট সপ্তাহ ধরে বেরোবে। এখন আমি যদি সময় চাই, তাহলে কয়েক সপ্তাহ স্টোরি ছাড়াই ম্যাগাজিনকে প্রেসে পাঠাতে হবে। ম্যানেজমেন্টের কাছে উত্তর দিতে হবে মহেশকে। মহেশ শেষে রেগে গিয়ে

বলেছিল, 'এত দিন চাকরি করে ডেডলাইনের মর্ম বোঝো না? ইয়ার্কি হচ্ছে? যদি এই স্টোরি ক্লিক না করে তো অন্য স্টোরি খোঁজো।'

মাথা গরম করে মহেশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেও, বুঝতে পারছিলাম ও ঠিক। আর অরুণ মুখ না খুললে এই স্টোরির কোনো মূল্যও থাকে না। অফিস থেকে বেরিয়ে খান মার্কেট থেকে এক বোতল ওয়াইন কিনে ফ্ল্যাটে চলে এলাম। সারা সন্ধে ওয়াইন খেতে খেতে *গুড ওমেনস* দেখলাম ল্যাপটপে। অফিসের ফোন তুললাম না। মহেশের ফোন পর্যন্ত কেটে দিলাম। এই সন্ধেটার দরকার ছিল, কারণ যদি সত্যিই স্টোরিটা করা না যায় তাহলে আগামীকাল থেকেই অন্য স্টোরি খুঁজতে হবে। তার আগে একটা সন্ধে আমার অন্তত চাই মাথাকে অরুণ চৌধুরীর গল্প থেকে বার করে আনবার জন্য। আর ঠিক পরের ভোরবেলাই, আমি তখনো গভীর ঘুমে, ফোন বাজল। হ্যাংওভার আচ্ছন্ন মাথা অনেকটা সময় সিদ্ধান্তই নিতে পারছিল না যে ফোন ধরবে নাকি সুইচ অফ করে দেবে—অবশেষে কোনো রকমে ফোন তুলে ঘুমজড়ানো গলায় বললাম, 'হ্যালো।' কে ফোন করেছে সেটাও দেখিনি।

'আমি অরুণ চৌধুরী বলছি। আপনি দার্জিলিং আসতে পারেন।'

কয়েক মুহূর্ত আমার মাথা কাজ করছিল না। স্বপ্ন দেখছি কি না, সেটাও ভাবছিলাম, এবং বিশ্বাস নামক ট্র্যাপিজের তারে দুলতে দুলতে যে প্রশ্নটা আমার নেশাজড়ানো জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ল, তার থেকে হাস্যকর কিছু ওই মুহূর্তে আর হয় না—'কেন?'

'কেন মানে? আপনি কি গল্পটা লিখতে চান না?'

'না মানে', নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার প্রবল চেষ্টায় অবশেষে কিছুটা থিতু হলাম। দুরু দুরু বুকে উঠে বসলাম খাটের ওপর। সত্যিই কি অরুণ রাজি হচ্ছেন? নাকি এর মধ্যেও কোনো প্যাঁচ আছে? 'আপনি মত বদলালেন কেন?'

'ভেবে দেখলাম, আপনিই ঠিক। আমি মারা যাবার পর আমার ভাবমূর্তি কী হলো, সেটা দেখতে আসব না। কিন্তু জীবদ্দশায় আর একবার চেষ্টা করতেই পারি।' একটু থেমে অরুণ আবার বললেন, 'কিন্তু আমার কথা আপনি বিশ্বাস না-ও করতে পারেন। এর আগেও বহু মানুষ করেনি। তাই আপনাকে একটা টাস্ক দেব। সেটা যদি করতে পারেন, তাহলে সত্যিটা আপনিই বুঝতে পারবেন।'

'কী টাস্ক?' ঢোঁক গিললাম। তাহলে সত্যিই প্যাঁচ আছে।

'ভয় পাবেন না। দৈহিক পরিশ্রমের কিছু নয়। মাথা খাটানোর রসদ দেব আপনাকে। বাকি কথা পরে, যখন দার্জিলিং আসবেন। আমাকে আগে থেকে তারিখ আর সময় জানিয়ে দেবেন।' ফোন রেখে দিলেন অরুণ।

ভাষা এসো সোনম প্রধানের শরীর ছুঁয়ে, এসো দিগ্বিদিক
প্রাণ এসো শেষ তুষারে পাইনের পা ভিজিয়ে ২৭/০৯/১৯৬৯
আর গাথা এসো জলচর শামুকের শাঁস যেভাবে নিংড়ে আনে প্রতিধ্বনি
আমাদের বিষাদনাভির গল্পে ছুটে আসুক পার্বত্য হরিণের দল
এসো স্বপ্নবিষ, হত্যাময় বরফ

আরও কয়েকটি
লাইন যাবে, এমন
হতে পারে যে

দশকের সঙ্গে কবিতাকে বেঁধে দেয় কোন শালা। সব অশিক্ষিত। তবু মনে হচ্ছে যেদিকে এগোচ্ছে ব্যাপারস্যাপার, বেশ কিছু রাগী চিৎকার শোনা যাবে। তারপর বলা হবে, এ দশক ক্রোধের দশক। হবেই। আমি শালা সমালোচক আর সাহিত্যবেত্তাদের হাড়ে হাড়ে চিনি। সবে এপ্রিল মাস, তার মধ্যেই এদিক ওদিক বলাবলি হচ্ছে, মুক্তির দশকে মুক্তির কবিতা এসব হাবিজাবি। ধুস! এদিক অনুকৃত আঙ্গিকের ওপর অধিকৃত আঙ্গিকের জয় ঘোষণার যে ব্যাপারগুলো আমরা ভেবেছিলাম, সেসব কই। সেই তো একই ধাঁচ, যে রকম পঞ্চাশের দশক থেকে চলে আসছে। সর্বনাশ করে দিয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারও আগে জীবনানন্দ দাশ। ভয়ানক প্রতিভাবান কবি আসলে কবিতার সর্বনাশ করে। পরের কয়েক দশক জুড়ে উত্তরসূরি কবিরা সেই ভাষা আর সেই আঙ্গিকের প্রভাব থেকে বেরোতে পারে না। এই সর্বনাশ মধুসূদন দত্ত করেছে, রবি ঠাকুর করেছে, আর তারপর এরা। কী ফ্রাস্ট্রেটিং। গদ্যে মনে হয় কমলবাবু এতটা করতে পারবে না, কারণ ও জিনিস নকল করা কঠিন। আর গদ্য ফদ্য অন্য জিনিস, মাথা না ঘামানোই ভালো। এদিকে উত্তরবঙ্গে কী সাংঘাতিক লেখাপত্র হচ্ছে, কলকাতা আর কবে জানবে। আগের মাসে একটা নতুন কাগজ বার করল অরুণদা। কবিতা চাইছে। কলকাতার কাগজে আর লিখব না শালা। কলোনির ইয়ে মারি। বেঁচে থাক আমার নর্থবেঙ্গল। অরুণটা যদি এসব বুঝত। ল্যাল্ল্যাড়

করছে, কলকাতার কাগজে জায়গা পাবে বলে। এ রকম গাণ্ডুমার্কা ভাবে কেন? পড়তে গিয়ে কলকাতা দেখে মাথা-ফাথা ঘুরে গেছে ওর। পাছায় ক্যাঁত ক্যাঁত করে দুটো লাথ কষিয়ে লেউড়েপনা বার করতে হয়।

শোন, কলকাতা থেকে কিছু ভালো লেখার কাগজ পাঠাস, আর ভালো তামাক। তোর টাকাপয়সার হাল কেমন? বাড়ি থেকে টাকা দেয়? নাহলে থাক। তবে ম্যাগাজিনগুলো পাঠাস মনে করে। হ্যাঁ আর কিছু পুরোনো কাগজ আছে, সব দিবি।

প্রিয় পার্থ, ২৩/১০/১৯৭০

চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল অনেকটা। জানিসই তো, জুতোয় পেরেক ছিল। 'আকাশ' সেবার কলকাতায় গিয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি, যাবার পথে জোগাড় করে এনেছিলাম। দিব্যি বার করছিলি তো, থামলি কেন দুম করে? তোর পাঠানো কবিতাটাও পড়লাম। কিন্তু এই এই যে লাইনগুলো—নীলোৎপল নাও, নাও এ কোমল হৃদয়ের তোমার রূপ দাও, তোমার জয় দাও অভয়ের—এখনো কাঁচা লাগছে কিছুটা। এ একরকম মন্ত্র-তন্ত্র আধারে তুই ক্লাসিক আবহ আনছিস, এতে উৎসাহ পাই না। প্রসাদে করো তারে যুধিষ্ঠির, উন্মোচিত হোক মহাতিমির—মানে, কেন? প্রার্থনার ফর্মে কবিতা লেখার নির্যাস তো আমাদের নয়, ছিল না। আবার—রণপ্রণয় দাও আর্ত পৃথ্বীকে—তোকেও কি তিমিরবরণদের রোগে ধরল নাকি? কানুবাবুদের শহীদ মিনারের সভায় গেছিলি টেছিলি মনে হচ্ছে? সে যাক, যা ভালো বুঝবি করবি। এদিকে কবে আসছিস জানা। যদিও দার্জিলিং শহর দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে, তবে তোকে নিয়ে নিবেদিতার সমাধি দেখতে যাব একবার।

ভালো কথা, সুব্রতর মেসের গদি নাকি সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে এসেছি। শুনলাম খুব রাগারাগি করছে। ওকে পারলে কিছু দিস। আমার পকেট তো বুঝতেই পারছিস!

—অমিতাভ

অমিতাভ গুপ্তর কবিতা পড়েছিস? নাকি দারুণ লিখছে টিখছে? আমি কয়েকদিন আগে শুনলাম। পাঠাতে পারবি, কয়েকটা স্যাম্পল?

সমীক্ষা, অলিন্দ, এ সময়ের কবিতা, নক্ষত্র,
এই কাগজগুলো পাঠাবি

উপত্যকায় অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলো। অনেকটুকু ঝড়ও চামচে করে ঢেলে দিল। এখন আকাশ ভারমুক্ত। আর চূড়ায় উঠলে হাত দিয়ে আকাশের গায়ে টোকাও মারা যেতে পারে। ঠিক যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার ছুঁচালো ঠোঁট আকাশকে চুমু খায়। আমার শহরে একফালি মনাস্ট্রি। দরজায় বসে আছে আহত বালিকা। কবাট থেকে জল চুইয়ে পড়ছে।

রাত্রির নির্জনতায় ওটুকু করুণ চোখের সেদ্ধজলে বেঁচে থাকা। শোঁ শোঁ ঝড়ের শব্দে পাথুরে হৃদয় জেগেছিল। এরপর তুষারপাত হবে। হিম জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকবে বিবর্ণ বালিকাজন্ম। কে তাকে দেখবে? মৃতের শহরে কেউ বেঁচে নেই। শুধু একপাল জিপগাড়ি মাথায় প্লাস্টিক চাপিয়ে ঘুমে। গাঢ় নির্জনতা। বালিকার পায়ের আঙুল মাটি খুঁজছে। কেঁচোর স্বপ্নে ফিরে আসে ভয়। জামা ভেসে যায় রক্তে। একান্তে লুটিয়ে থাকা একটি বোতাম, ছেঁড়া। শান্ত শ্বাস ফেলে। ওই, ওই যে আবার বৃষ্টি এসেছিল। ছোট গাছেরা লম্বা হয়ে উঠেছিল। রক্তাক্ত জামার ভেতর মুখ গুঁজেছিল ভিতু কেঁচো। চোর স্বপ্নখনির গহ্বর নেমে গেছিল অন্ধকার পাতালে। সে জানেনি। এখন গোল পতঙ্গের নিঃশ্বাস বৃষ্টির মনাস্ট্রিকে ঘিরে। ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ প্রজাপতি উড়ে আসবে। মুখ গোঁজা আহত বালিকা চাখবে আমাদের গল্পকথা। উপত্যকায় চাঁদ উঠবে। জন্মদিনের পায়েসের থালার মতো। ~~মৃত বাবার কপালে চন্দনের ফোঁটার মতো।~~ কেঁচোদের দল সে পায়েস বুক ভরে দেখে নেবে। মুখ ভরে।

আর কতদূর বাকি আছে আমাদের সমবেত কবিজন্ম, হে সাদা পাহাড়ের ঈশ্বর?

পার্থ, ১৯/১২/১৯৭০

নতুন দশক তাহলে তোর কবিতার বই দিয়েই শুরু হলো, কী বল? এপ্রিলে কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের শুওরের ঝোল খাওয়াবি, মনে থাকে যেন। তবে শুধু এটুকুতেই কি আর উদযাপন শেষ হবে আমাদের? আগেরবার মেটিয়াবুরুজের একটা বেশ্যাপট্টিতে প্রচুর ফূর্তিফার্তা হয়েছিল, ছিলিস না সেবার, স্বাভাবিক, তুই তো আর যাবি না ওসব জায়গাতে। টকটকে লাল মাংসের ঝোল আর মোটা মোটা পোড়া রুটি, সঙ্গে লংকার আচার, লেবুর রস দিয়ে বাংলা। তবে বাদ দে এসব। তোকে নিয়ে সারারাত তোদের গঙ্গার কিসের ঘাটগুলো আছে, বড়বাজারের দিকে, ওগুলোতে ঘুরব, আর

চিৎকার করে করে তোর বইটা থেকে কবিতাগুলো পড়ব সারারাত, আর যারা জেগে থাকবে তাদের দেখিয়ে বলব—দেখুন শ্রদ্ধেয় বানচোদের দল, আমার বন্ধুর কবিতার বই দিয়ে দশক শুরু হলো। যারা ঘুমাবে, তাদের কানের কাছে গিয়ে তারস্বরে ফাটিয়ে বলব—পতনজাত ভয় রুদ্ধনিশ্চয় শঙ্কাশীল / লোল লেলিহান কৃষ্ণ খরশান রক্তাবিল—কী সব লিখেছিস শালা! এভাবে অন্য গ্রহের ভাষায় লিখতে পারে কেউ? বাকি কথা কলকাতা গিয়ে। দামি মদ খাবো তোর ঘাড় ভেঙে।

তিনটে কবিতা পাঠালাম। দরকার পড়লে এডিট করে নিস। জামশেদপুরের কমলকে দুটো পাঠাতে বলেছে, ওখানকার কাগজের জন্য। চমৎকার লিখছে ছেলেটা। ওর কালিমাটি রোড বলে একটা কবিতা পড়ে হাঁ হয়ে যাচ্ছি। আর শোন, অরুণকে আবার বলিস না তোর থেকে টাকা নিয়েছিলাম। ও শালা ফালতু গরম নেবে আমার ওপর। এমনিতেই হুমকির ওপর রেখেছে, মদ না কমালে বোতল ভেঙে পেটে ঢুকিয়ে দেবে। আমি কলকাতায় গিয়ে টাকাটা দিয়ে দেব।

কখনো মনে হয় স্ক্যাপরুমে দীর্ঘ বসে আছি, চারিদিকে নষ্ট যন্ত্রপাতি
ভাঙা লেড জং ধরা স্ক্যাংক ক্রাফট পড়ে
এদের এড়িয়ে গিয়ে অন্য কোনো শহরের কথা
আর ভাবা যায় না তেমন
—কমলের কালিমাটি রোড। যদি না পড়ে থাকিস। স্বদেশ সেনও
জামশেদপুরের না? একে একদমই চিনি না, বয়েসে অনেক বড়ো শুনেছি।
তোর আলাপ আছে?